হজ্জ্ব এবং এক মহান নারীর অবহেলিত ঐতিহ্য

(ঈদুল আজহা-র একটি খুতবা অবলম্বনে)

ডঃ মোহাম্মদ ওমর ফারুক

মূলঃ Hajj and the Neglected Legacy of a Great Woman

ইসলাম আমাদেরকে পূর্ণাঙ্গভাবে ও নিবেদিত চিত্তে আত্মসমর্পণ করতে শেখায়। ‘‘ও বিশ্বাসীরা! তোমরা ইসলামে দাখিল হও পূর্ণরূপে ...’’ [কোর্‌আন/২/আল-বাকারাঃ ২০৮]

ইসলাম সেই আত্মসমর্পণের জন্য আহ্বান জানায় যা স্বতঃস্ফূর্ত ও বিবেকসম্মত, যাতে আল্লাহর ইচ্ছে ও হেদায়েতের বিরুদ্ধে কোন ধরণের দ্বিধা, বাঁধা বা কুণ্ঠা থাকে না। ‘‘না, (হে মুহাম্মাদ!) তোমার রব্বের শপথ, তারা কোনভাবেই ঈমানের দাবী করতে পারে না, যতক্ষণ তারা যাবতীয় বিসংবাদে তোমাকে তাদের বিচারক হিসেবে মেনে না নেয়, এবং তোমার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাদের হৃদয়ে কোন কুণ্ঠা না থাকে; বরং তা মেনে নেয় পূর্ণ আস্থার সাথে।’’ [কোর্‌আন/৪/আন-নিসা: ৬৫]

আল্লাহর কাছে থেকে বড় - সত্যিই বড় - সংবাদ রয়েছে। ‘‘যাদের ঈমান আছে ও যারা সৎ কাজ করে, তারাই সৃস্টির শ্রেষ্ঠ; তাদের পুরষ্কার আল্লাহ্‌র কাছেঃ চিরন্তন বাগিচা, যার নীচ দিয়ে জলধারা বয়ে যায়; তারা সেখানে চির কাল থাকবে; আল্লাহ তাদের ব্যাপারে সন্তষ্ট, এবং তারাও তার সাথে ...’’ [কোর্‌আন/৯৮/আল-বাইয়েনাহ্‌: ৭-৮]

ঈদুল আজ্‌হা আনন্দ ও উৎসবের এক মহান ও অনন্য উপলক্ষ। Paradoxically, এই আনন্দ-উৎসব ত্যাগ-কেন্দ্রিক। এই উপলক্ষটির যথার্থ তাৎপর্য হয়ত তারাই বুঝতে পারবে যারা তাদের নিজেদের চাওয়া-পাওয়ার চেয়ে দেয়ার মাঝে - বিশেষ করে যা অন্যদের জীবনে ইতিবাচক পরশ আনে - বেশী তৃপ্তি ও সুখ আহরণ করে।

ঈদুল আজ্‌হার এই মহান উপলক্ষটি জড়িত একটি অনন্য ঘটনা - হজ্জ্ব-এর সাথে; একটি অনন্য শহর - মক্কা-র সাথে; এবং একটি অনন্য পরিবার - নবী ইব্রাহীমের পরিবার-এর সাথে। বস্তুতঃ কুর্‌আনে যে মিল্লাতে ইব্রাহীমির উল্লেখ আছে তার গোড়ায় রয়েছে এই মডেল পরিবারের ঐতিহ্য। ‘‘বলঃ ‘আল্লাহ সত্য বলেনঃ তোমরা একনিষ্ঠ হয়ে অনুসরণ কর ইব্রাহীমি মিল্লাতের; সে মুশরিকদের একজন ছিল না।’’ [কোর্‌আন/৩/আলে ইমরান:৯৫]

আমরা ঈদুল আজহার প্রসঙ্গ আলোচনা করতে পারি না, হযরত ইব্রাহীমকে স্মরণ করা ছাড়া, যে কুর্‌আনে একটি মডেল আত্মসমর্পণের দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিচিত। তার রব্ব (সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক এবং বিবর্তক)-এর ডাক শুনতে বা নির্দেশনা পালনে তিনি কখনো সামান্যতম দ্বিধা করেননি। তার রব্বের ইচ্ছে পূরণ করার ব্যাপারে কোন কিছুকেই অতি মূল্যবান মনে করেননি। যা কিছু তিনি করেছেন, তা আল্লাহর আদৃষ্ট হয়েই, এবং প্রতিটি নির্দেশই তিনি বিবেকসম্মত ভাবে পালন

করেছেন - সম্মান ও মহত্তের সাথে। আমরা সবাই পরিচিত তার অটল বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের সাথে, এবং তার চরম কোরবাণীর সাথে যা সেই ঘটনার মাঝে বিধৃত যাতে তিনি তার প্রাণপ্রিয় ও একমাত্র পুত্রকে আল্লাহর ইচ্ছে অনুযায়ী কোরবাণী দিতে তৈরী ছিলেন। ‘‘দেখ! তার রব্ব তাকে বললঃ ‘আত্মসমর্পণ কর!’ সে উত্তর দিলঃ ‘আমি আত্মসমর্পণ করলাম সারা জাহানের রব্বের কাছে।’’’ [কোরআন/২/আল-বাকারা:১৩১]। আমরা অবশ্য জানি, আল্লাহতায়ালা সত্যি সত্যি চাননি যে হযরত ইব্রাহীম তার সন্তানকে জবেহ করেন। আল্লাহ তায়ালা নিছক চেয়েছিলেন ইব্রাহীম নবী হিসেবে তার কাছে পরিপূর্ণ ও নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করতে তৈরী ছিলেন কিনা। কোন মমতাময় খোদা বাস্তবিকই নিজের হাতে আপন সন্তানকে কোরবাণী দেবার মত আনুষ্টানিকতায় বাঁধতে পারে না।

এই পরিবারের আরেক দৃষ্টান্তমূলক সদস্য ছিল হযরত ইব্রাহীমের পুত্র, ইসমাইল। কুর্আন তাকে পেশ করে বাবার মতই পুত্র হিসেবে। যেমন বাবা, তেমনি পুত্র! ‘‘সে (ইব্রাহীম) বলল! ও আমার পুত্র, আমি এক স্বপ্নে দেখেছি যে তোমাকে আমি কোরবাণী দিচ্ছি। এ ব্যাপারে তুমি কি বল?’ সে (পুত্র) বললঃ ‘আমার পিতা! তাই করুন যেমনটি আপনি আদ্দিষ্ট। ইনশাল্লাহ, আপনি আমাকে পাবেন শান্ত-সমাহিত ও ধৈর্যশীল। ’’ [কোর্আন/১৯/মরিয়ম:১০২]

আল্লাহতায়ালার ইচ্ছের কাছে তার আত্মসমর্পণে, হযরত ইসমাইল কোনভাবেই কম দৃষ্টান্তমূলক ছিলেন না। তিনি আল্লাহর কাছে পূর্ণ চিত্তেই আত্মসমর্পণ করেন - শান্ত ও সমাহিতভাবেই। তবে আমাদের মাঝে হয়ত খুব কম সংখ্যক মুসলিমই আছে যারা তাওহীদ ও চিরন্তন সত্যের ইতিহাস-ঐতিহ্যে হযরত ইসমাইলের ভূমিকা ও অবস্থানের সাথে পরিচিত নয়।

সাধারণভাবে আমরা যেমনটি স্মরণ করি হযরত ইব্রাহীম ও ইসমাঈলের কাহিনী, তা থেকে আরেকটু অগ্রসর হয়ে, আমি আজ আলোকপাত করতে চাই আমাদের মা হাজেরা, এক মহতী নারীর ঐতিহ্যের ওপর যার ব্যাপারে সচরাচর তেমন কোন আলোচনা হয় না। তিনি ছিলেন হযরত ইব্রাহীমের স্ত্রী ও হযরত ইসমাইলের মাতা। মা হাজেরা তাওহীদি ঐতিহ্য ও মিল্লাতে ইব্রাহীমির এক অবিচ্ছদ্য ও স্বকীয় অংশ। যেমন আদর্শ ছিল হযরত ইব্রাহীম ও ইসমাইলের আত্মসমর্পণ ও কোরবাণী, তেমনি আদর্শ ও দৃষ্টান্তমূলক ছিল আল্লাহতায়ালার কাছে মা হাজেরার আত্মসমর্পণ ও তার ত্যাগ-সাধনা। তার ঐতিহ্য ও স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করার জন্য তাকে এক অনন্য সম্মানের আসনে কোর্আনে চিহ্নিত করা হয়েছে, ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদী উপাসনার একটি, হজ্জে, সাফা ও মারওয়ার মাঝে দৌড়ানোকে আবশ্যকীয় অংশ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করার মাধ্যমে। এ দুটি ছিল সেই পাহাড় গুলো, যেখানে তিনি আল্লাহতায়ালার ইচ্ছে ও পরিকল্পনা অনুযায়ী, এক নির্জন, জনমানবহীন প্রান্তরে, একাকী, এক পাহাড় থেকে আর একটিতে বারংবার মরিয়া হয়ে দৌড়াদৌড়ী করেছেন তার প্রাণপ্রিয় শিশুকে বাঁচানোর জন্য পানির সন্ধানে। ‘‘নিশ্চয়ই, সাফা ও মারওয়া আলাহতায়ালার নিদর্শন-সমূহের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। তাই, যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘরের হজ্জ বা ওমরাহ্ করবে, এই দুই পাহাড়ের মধ্যে দৌড়ানো তার পক্ষে কোন পাপের কাজ নয়। আর যে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছা-আগ্রহ ও উৎসাহে কোন ভাল কাজ করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা তার সম্পর্কে অবহিত এবং তার প্রতিদান দান করবেন।’’ [কোর্আনঃ ২/আল-বাকারা/১৫৮]

যদি পাঠকদের কেউ ইতিমধ্যেই না পড়ে থাকেন, আপনাদের আমন্ত্রণ জানাই এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানার জন্য সহীহ আল-বুখারী থেকে মা হাজেরা প্রসঙ্গে একটি হাদীস পড়ার জন্য। (Vol. 4, #583, Book of Ambiya or Prophets).

মা হাজেরা নিছক হযরত ইব্রাহীমের স্ত্রী ছিলেন না, বরং তার জন্য ছিল হযরত ইব্রাহীমের গভীর ভালবাসা। তবু, আল্লাহতায়ালারই পরীক্ষার অংশ হিসেবে তিনি হাজেরা ও তাদের প্রাণাধিক শিশু সন্তান ইসমাইলকে নিয়ে আসেন মক্কার শুন্য, নির্জন, জনবসতিহীন উপত্যকায়। সে সময় মক্কা

বলতে কোন জনবসতি ছিল না।

সেই পরিত্যক্ত, রুক্ষ, বিরান উপত্যকায় যখন হাজেরা ও ইসমাইলকে ইব্রাহীম নিয়ে এলেন, এবং যাবার উদ্যোগ নিলেন, হাজেরা জিজ্ঞেস করলেন (যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে): ''ও ইব্রাহীম! তুমি কোথায় যাচ্ছ, আমাদেরকে এমন এক উপত্যকায় ফেলে যেখানে না আছে কোন মানুষ আর না কিছু বাঁচে।'' সে কয়েকবার একই প্রশ্ন করলো, কিন্তু ইব্রাহীম কোন জবাব দিল না। তখন সে জিজ্ঞেস করলো, ''এটা কি আল্লাহর নির্দেশে?'' ইব্রাহীম বললেন, হ্যাঁ। ...

এতটুকুই মা হাজেরার জন্য যথেষ্ঠ ছিল। এখন তার বোধগম্য হোল যে এসব আল্লাহতায়ালার ইচ্ছের প্রতিফলন। ঈমানের মহত্তের যে সম্মানিত ধারা ঐ তাওহীদি পরিবারের ঐতিহ্য, সেই অভিন্ন জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে তিনি বললেনঃ ''তাহলে আল্লাহতায়ালা আমাদের পরিত্যাগ করবেন না।'' (অন্য আরেকটি বর্ণনায়) ''আমি আল্লাহর ইচ্ছার ওপর সন্তুষ্ট''।

তারপর হযরত ইব্রাহীম ফিরে গেলেন আর হাজেরা রইলেন একাকী, শিশু সন্তানের সাথে। মক্কা তখনও কোন জনবসতি হয় ওঠেনি। যা সামান্য খাদ্য ও পানীয় ইব্রাহীম সঙ্গে দিয়ে গিয়েছিলেন মা ও সন্তানকে তা অল্প সময়ের মধ্যেই ফুরিয়ে এলো। মরিয়া হয়ে তখন হাজেরা পানির সন্ধানে বের হলেন এবং সাফা-মারওয়ার দুই পাহাড়ের মাঝের উপত্যকায় বার বার এক পাহাড় থেকে আরেকটিতে ছোটাছুটি করতে থাকলেন। তার বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি হিসেবে আল্লাহতায়ালা ইব্রাহীমের পরিবারকে পরিত্যাগ করেনি। বরং ফিরিশতাদের নেতা জিব্রাইল হাজেরার সামনে উপস্থিত হন। *একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নঃ কোন ধরণের মানুষের সাথে জিব্রাইল দেখা-সাক্ষাত করেন?*

আল্লাহতায়ালার সরাসরি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে চির বহমান কূপ-সম উৎস জমজম থেকে পানি যোগান হোল এই নারী ও তার সন্তানের জন্য। ঠিক এরকম সময়েই, জুরহুম গোত্র ওই উপত্যকা পার হচ্ছিল এবং লক্ষ্য করলো আকাশে পাখি উড়তে। এটাকে পানির উপস্থিতির নিদর্শন মনে করে তারা তার সন্ধান করতে লাগলো এবং ঘুরতে ঘুরতে এসে পেল মা হাজেরা ও ইসমাইলকে। তারা সেখানে বসতি স্থাপন করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলো। এমনি ভাবেই, মক্কার বিরান উপত্যকায় এক জনবসতির সূচনা হলো। পরবর্তীতে হযরত ইব্রাহীম প্রত্যাবর্তন করেন এবং কা'বার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। ধীরে ধীরে মক্কা নিছক একটি জনবসতি নয়, বরং নগরী হিসেবে এবং এক আল্লাহ্-এ বিশ্বাস অর্থাৎ তাওহীদের চিরন্তন প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হলো।

সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ মহান এবং তিনি এমন একটি অসামান্য ও অনন্য কাজ গ্রহণ করলেন এক নারী থেকে। আরেকটি দিকও প্রণিধানযোগ্য। কেমন একটি অবস্থার মধ্যে মা হাজেরা পড়েছিলেন? এমন একটি নির্জন, জনবসতিহীন উপত্যকায়, একটি অসহায় শিশু সন্তানকে কোলে নিয়ে তার মনের মধ্যে কি অনুভূতি ও চিন্তাই না প্রবাহিত হচ্ছিল!

নিঃশর্ত ভাবে আল্লাহতায়ালার কাছে আত্মসমর্পণ করে, সে নিজের কথা সামান্যতমও না ভেবে হন্যে হয়ে সন্ধান করছিল, ঘুরছিল, সংগ্রাম করছিল একটু পানির জন্য, তার সন্তানটিকে বাঁচানোর জন্য। তার মনের মধ্যে কি ভাবনা ও অনুভূতি ঘুরপাক খাচ্ছিল? ডঃ আলী শরীয়তী, হজ্জ্ব শীর্ষক তার বিখ্যাত গ্রন্থে, এ প্রসঙ্গেই কিছু মূল্যবান আলোকপাত করেছেন। হাজেরা একসময় ছিল নিছক ক্রীতদাসী। ক্ষমতাশালী ও বিত্তবানদের প্রতিনিধি হিসেবে রাজা, তার মালিক, উপঢৌকন হিসেবে তাকে দিয়ে দেন আরেক জনের হাতে; তার প্রাণাধিক পরিবার তাকে শিশু সন্তানসহ তাকে ফেলে রেখে গিয়েছিল একাকী, এক নির্জন, দুর্গম প্রান্তরে। জীবনে সম্মান, মর্যাদা, নিরাপত্তা ও সুবিচার কি জিনিস সে ব্যাপারে তার কোন অভিজ্ঞতা হয়নি। সে যদি ইসমাইলের মা না হতো, কে তাকে জানত আর মর্যাদা দিত? ঐ নির্জন উপত্যকায়, তার পরিচিতির-ই বা কি মূল্য ও প্রাসঙ্গিকতা ছিল? তবু, তার সৃষ্টিকর্তা ও রব্বের কাছে বিনা দ্বিধায় ও নিষ্ঠচিত্তে সে আত্মসমর্পণ করেছিল এবং আল্লাহর পথে যা কিছু তার পক্ষে করা সম্ভব ছিল - পাহাড় থেকে পাহাড় পর্যন্ত মরীচিকাসম পানির জন্য অবিরাম ঘুরে - সে সাধনা করেছে।

নিজেদেরকে প্রশ্ন করা যাক। যদি কোন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করতে হয় নগরী হিসেবে মক্কার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে, সে কে?* কে তার মধ্যে অগ্রগণ্য? ইতিহাসে আর কোন সভ্যতা বা এই মর্যাদার আর কোন নগরী আছে কি, যার উৎপত্তি বা প্রতিষ্ঠা হয়েছে এক নারীর এমন মৌলিক অবদান ও ত্যাগের মাধ্যমে? অথচ, কেমন হাস্যকর ও দুঃখজনক, যে নগরীর প্রতিষ্ঠা ও সূচনাই হয়েছে একাকী এক নারীর ত্যাগ-সাধনার মাধ্যমে, সেই দেশে - যেখানে মক্কা ও তাওহীদের প্রাণকেন্দ্র - সেখানে নারীদের গাড়ী চালাতে অনুমতি নেই। তাছাড়া সামগ্রিকভাবে প্রচলিত ইসলামী ফিকাহ্-এ নারীদের একাকী ভ্রমনের অনুমতি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, যদিও নবী করিম (সঃ) নিজে তার ভবিষ্যতবাণী (বা স্বপ্ন) সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে গেছেন যে, এমন সময় আসবে যখন একজন একাকী মহিলা অনেক দূর থেকে হজ্জ্ব করতে আসবে কোন রকম নিরাপত্তাহীনতা ছাড়াই, এবং হাদীস বর্ণনাকারীর জীবদ্দশাতেই সে ভবিষ্যতবাণী সত্যে পরিণত হয়েছিল। (মুসনাদে আহমাদ, ৪র্থ খন্ড, #১৯৩৯৭, ১৯৪০০; সহীহ আল-বুখারীঃ ৪র্থ খন্ড, #৭৯৩)

এটাও দুঃখজনক,এই যে ঈদ উপলক্ষের সাথে মা হাজেরার স্মৃতি ও ঐতিহ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেই উপলক্ষেও তাকে সচরাচর স্মরণ করা হয় না। আমি কখনো কোন ঈদুল আজহার খুতবা শুনিনি, যাতে তার দৃষ্টান্তমূলক ঈমান, ত্যাগ-কোরবাণী ও অবদান, যা আর কারো তুলনাতেই কোন অংশে কম ছিল না, তার ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। আমি নিজেও বুখারী শরীফ আগাগোড়া আগে পড়েছি, কিন্তু সমসাময়িক এক মুসলিম চিন্তাবিদ, তাওহীদি ঐতিহ্য ও ধারায় নারীদের অবদান সম্পর্কে যিনি নিজে সচেতন এবং আরো অনেককেই সচেতন করেছেন, তার এ প্রসঙ্গে লেখনী না পড়া পর্যন্ত আমিও এরকম ভাবিনি।*

নারী এবং পুরুষেরা এমন একজন নারীর কাছে থেকে কি শিখতে পারে, যার ত্যাগ ও অবদানকে সম্মানিত করতে আল্লাহতায়ালা সাফা-মারওয়ার পাহাড়দ্বয়কে আল্লাহর আয়াত বা নিদর্শনের পর্যায়ে উন্নীতে করেছেন, যা দর্শন করা এবং নিজের প্রাণাধিক যা তার জন্য আত্মোৎসর্গ করার সাধনার ঘটনাটি নিজেরাও পালন করাকে প্রতিটি হজ্জ্বকারীর ওপর আবশ্যকীয় করেছেন?

হজ্জ্বে গমনকারীরা যেমন এই আনুষ্ঠানিকতাগুলো পালন করছেন, সূদূর থেকে আমরাও ইসমাইল হতে চাই এবং এই মহতী নারীর স্নেহ-মমতার ভাগ পেতে চাই। কিন্তু এই আনুষ্ঠানিকতার আরো গভীরতর symbolic তাৎপর্য রয়েছে।

মুসলিম উম্মাহ নবী করিম প্রদর্শিত ধারা অনুসরণ করে, যে ধারা মূলতঃ ইব্রাহীম ও তার পরিবারের ধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত। যে ভূমিকা ইব্রাহীমের পরিবার পালন করেছিল, সেটি পরে রাসূলুল্লাহ্‌র জীবনের মধ্যে রুপায়িত হয়েছে, তবে এক্ষেত্রে নিছক পরিবারকেন্দ্রিক ভূমিকা নয়, বরং বিশ্বাসীদের বৃহত্তর কমিউনিটিকে নিয়ে। আরো বৃহত্তর পর্যায়ে এই উম্মাহ্‌কে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সমগ্র মানবতার জন্য! [আল-কুর্‌আন/৩/আলে ইমরান/১১০]

তখন যেমন সত্য ছিল, আজও তা ঠিক যে, মানবতা এখন ধ্বংসের পথে ধাবিত। তাহলে আমাদের কি ভাবা উচিত নয় যে মানবতা যেন মৃত্যুর শিয়রে ইসমাইল, এবং সেই মানবতা, যার অংশ আমরাও, তাকে ধ্বংসের পরিণতি থেকে বাঁচানোর জন্য মা হাজেরার মত আকুল অনুভুতি ও মমতার বারংবার প্রয়োজন? রাসূলুল্লাহ্‌র জীবন কি রহমত ও মায়া-মমতার সেই মিশন ঘিরেই ছিল না, এবং এ জন্যেই কুর্‌আনে তাকে কি রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন (সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য রহমত) হিসেবে পেশ করা হয়নি? তার অনুসারী সাহাবারাও কি অভিন্ন মিশন নিয়ে জীবন উৎসর্গ করেননি? তাহলে এই উম্মাহ্‌র কি সচেতন হওয়া প্রয়োজন নয় সেই দায়িত্ব-আমানতের ব্যাপারে, যা আল্লাহ্‌তায়ালা উম্মাতের ওপর অর্জন করেছেন এবং যে ব্যাপারে তাদের জবাবদিহী করতে হবে? এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করতে এবং নিজেদেরকে সেই আমানত ও দায়িত্বের ব্যাপারে স্মরণ করাতে এর চেয়ে শ্রেয়তর উপলক্ষ আর কি হতে পারে?

উপসংহারে, তাহলে এখানে উৎসব-উচ্ছাসের কি রয়েছে?

‘‘খোদা! তুমি তোমার রসূলদের মাধ্যমে আমাদের সংগে যে ওয়াদা করেছ, তা তুমি পূর্ণ কর এবং কিয়ামতের দিন আমাদের লজ্জার সম্মুখীন কোর না। এটা নিঃসন্দেহ যে, তুমি কখনোই ওয়াদা খেলাফকারী নও।’’ উত্তরে তাদের খোদা বললেন, ‘‘আমি তোমাদের মধ্যে কারো কাজকে বিনষ্ট করে দেব না, পুরুষ হোক বা নারী হোক-তোমরা সবাই সমজাতের লোক। কাজেই যারা একমাত্র আমারই জন্য নিজেদের জন্মভূমি পরিত্যাগ করেছে, আমারই পথে নিজেদের ঘর-বাড়ী হতে বহিস্কৃত হয়েছে ও নির্যাতিত হয়েছে, তাদের সকল অপরাধই আমি মাফ করে দেব এবং তাদেরকে আমি এমন বাগিচায় স্থান দেব যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে। খোদার নিকট এই তাদের প্রতিফল। আর উত্তম প্রতিফল একমাত্র খোদার কাছেই পাওয়া যেতে পারে।’’ [আল-কুর্‌আন/৩/আলে ইমরান/১৯৪-১৯৫]

আমাদের যত কষ্ট-সাধনা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, প্রয়াস ও সংগ্রাম, এতে কি আমাদের আনন্দ-উৎসবের কারণ নেই যে সে সব বিফলে যাবে না? এ নিশ্চয়তা বা গ্যারান্টি যে স্বয়ং আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ থেকে!

আমার জন্য এটাই তো যথেষ্ঠ। দুনিয়াবী যত প্রতিজ্ঞা, প্রতিশ্রুতি বা গ্যারান্টি আমাদের এক ধরণের মনের প্রশান্তি বা স্বস্তি আনে, তার সমান্তরালে আমরা ভূলে যাই যে এ জীবনে কত কিছুই না নিছক ভ্রান্তি বা ছলনা। আল্লাহ্‌র দেয়া গ্যারান্টি যদি আমাদের মনের স্বস্তি বা প্রশান্তির জন্য যথেষ্ঠ না হয়, তাহলে আর কে এর চেয়ে বড় নিশ্চয়তা দিতে পারে? তাই, আমাদের রাহমানুর রাহীম সৃস্টিকর্তার যে আহ্বান ও নিমন্ত্রণ চিরন্তন শান্তি, সুখ ও সমৃদ্ধির পানে, যে ব্যাপারে তার কাছে থেকে এসেছে অমোঘ নিশ্চয়তা, তা নিয়ে উৎসবে মেতে ওঠার জন্য শ্রেয়তর উপলক্ষ আর কি হতে পারে? অবশ্য এটার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে ওসংকল্প ও নিষ্ঠা থাকা প্রয়োজন সমগ্র মানবতার জন্য শান্তি, সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য ইতিবাচক ও গঠনমূলক প্রয়াসের জন্য।

*এ প্রসঙ্গে আমি প্রথম আলোকিত হই ডঃ কাওকাব সিদ্দিকীর একটি কাজ থেকে। তার অন্যান্য কাজ ও মতামতের ব্যাপারে আমি মন্তব্য করতে পারি না, কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে নারী সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে তার কাজগুলো প্রাসঙ্গিক ও মূল্যবান।

[ডঃ ফারুক আপার আইওয়া ইউনির্ভাসিটিতে অর্থনীতি ও ফাইন্যান্সের একজন অধ্যাপক। হোমপেইজঃ http://www.globalwebpost.com/farooqm]

Home